# দুঃখিনী বর্ণমালা

মৃণাল নাথ



।। নিঃশব্দ চরণে।।

বাঙলা বানানের স্বনিযুক্ত অভিভাবক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রবর্তিত বানান যে ১৯৯৯ সাল থেকে প্রাথমিক স্তরে প্রচলিত ছিল তা জানতাম না। বানানবিধির পুস্তিকায় আকাদেমির আজীবন সচিবের বয়ানে দেখেছিলাম যে বিভিন্ন শিক্ষা পর্ষদের ঘাড়ে যে তা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে নিঃশব্দে যে এমন বিপ্লব ঘটে তা জানতে পারি আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় পাঠে। জেনে যেমন বিস্মিত হয়েছি, তেমনই স্তম্ভিতও হয়েছি। শিশুপালবধের আয়োজন যে বহু আগে থেকেই চলে আসছিল সে শিশুমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করার প্রয়াসে এবার বানানকর্তারা মধ্য শিক্ষার উপর হাত দিয়েছেন, অর্থাৎ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ আকাদেমির বানানবিধি প্রচলনে 'উৎসাহ' দেখিয়েছেন। এই 'উৎসাহ' দেখিয়েছেন! এই 'উৎসাহ' দেখানো ব্যাপারটা আমরা জানি কী বস্তু। খুব চতুর কৌশলেই তাঁরা এ কাজটা করেছেন। শিশুরা ১৯৯৯ থেকে নতুন বানান শিখবে। চার বছর পরে আর তাকে পুরোনো বানানো ফিরে আসতে হবে না, তাই এ বছর থেকে মধ্য শিক্ষা পর্ষদ নতুন বানান প্রচলনের নির্দেশিকা তথা ফতোয়া জারি করেছেন পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য। এর উঁচু ক্লাসেও চলবে নতুন বানান রীতি। আমরা জানি বিভিন্ন পর্ষদবা সংসদে যাঁরা নিযুক্ত হন, তাঁদের নিষ্ঠা কাদের প্রতি, তাঁরা কাদের আজ্ঞাবহ। তাঁরা সরকারি কর্তাদের এবং - তাঁদের দাক্ষিণ্যপ্রাপ্তদের হুকু ম তামিল করেন, সেই হুকুমই প্রকারান্তরে বা অর্থান্তরে উৎসাহে পরিণত হয়! শুনেছি কলকাতার কাছকাছি (দক্ষিণ শহরতলির বা উত্তর কলকাতার বা নদিয়ার নয়) পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ এই বানান বিধি প্রচলনে 'উৎসাহী', তাঁরা নাকি আকাদেমিকে অনুরোধ করবেন তাঁদের বানান প্রচলনের জন্য। কার নির্দেশে জানি না, তবে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ তাঁদের প্রাপত্রে এ বানান প্রচলন শু করে দিয়েছেন। জানি না, লিপিও প্রচল করেছেন কিনা।

মধ্য শিক্ষা পর্ষদের পুস্তকে বানানবিধি অনুসরণ হবে বলে যখন নির্দেশিকা জারি করা হয় তখন তেমন হৈ- চৈ হয় নি। তা ছিল প্রকাশক এবং লেখকদের মধ্যে নিবদ্ধ। সাধারণ লোকে যখন জানতে পারেন একটি পত্রিকা মারফত, সরকারের বা আকাদেমির তল্পিবাহক নন এমন বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন। সভা - সমিতিও করেছেন। ভবিষ্যতেও হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রে অবিচল আস্থাশীল কিন্তু বানানে বিপ্লবী বীরেরা হটে যাবার পাত্র নন। ঔদ্ধত্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে, তাঁদের কেউ কেউ সভা-সমিতিতে বলেছেন, "করেছি, বেশ করেছি, করবই তো..." (ভাগ্যিস সেই বীর তাঁর কর্কশ কণ্ঠে গানটি গেয়ে ফেলেন নি)। মজার কথা হল পর্ষদের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে 'পুস্তক রচনার সময় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত 'বাংলা বানানবিধি' অনুসরণ করতে হবে।" তাতে কিন্তু আকাদেমির বানানবিধি আদৌ অনুসরণ করা হয় নি। অথচ পর্ষদ অনুসরণ করতে বলছেন। একে অনায়াসেই বলা যেতে পারে পার্শ্বদিক কূটাভাস। আকাদেমির বানান অনুসরণ না করলে সে বই বাতিল বলে গণ্য হবে এমন একটা প্রচ্ছন্ন হুমকিও গভীর তলে থাকে। প্রকাশকেরা সন্ত্রস্ত থাকেন কিন্তু নির্দেশিকায় আকাদেমির বানান অনুসরণ না করলে সেই নির্দেশিকা বাতিল হবে না! নির্দেশিকার হোতারা বানান বিষয়ে অবহিত নন, এটা লজ্জার ও পরিতাপের বিষয়। তাঁরা এক বানান রীতি অনুসরণ করতে বলেছেন, নিজেরা তা অনুসরণ করছেন না!

আবার বানানের আওতা থেকে তাঁরা heritage writer -দের বাদ দিয়েছেন বলে শুনেছি। heritage writer কথাটা অধুনা শুনছি, মানে বুঝি না; আমার অজ্ঞতা হতে পারে। পর্ষদীয় অভিধানে সম্ভবত এমন ইংরেজির কোনো মানে আছে ওঁদের সিলেবাস দেখলে পান্ডিত্যের বহর বোঝা যাবে। (heritage building জানি, heritage monument -ও জানি, cultural heritage -ও জানি, কিন্তু heritage writer কী বস্তু জানি না। ধ্রুপদী লেখকেরা কী স্মারক বস্তু? খাজুরাহো, কোনার্ক, অঙ্কোর ভাট বা আঙ্কোর থাম? ধ্রুপদী লেখকেরা তো তা হলে আর্কেয়োলজিক্যাল সার্ভের অধীনে?
বানান বিধির বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। (অন্য কোনো সময়ে করা যেতে পারে।) কিন্তু কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা জরি বলে মনে হয়েছে। তবু একথা বলতেই হয় যে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি যে বানানবিধি প্রণয়ণ করেছেন, তার বহু নিয়মে সংস্কৃত জ্ঞানের অভাব, ফরাসি শব্দকে সংস্কৃত শব্দ বলাহয়েছে অথচ সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষার ছড়াছড়ি সেখানে। বানানবিধির পুস্তকে কেন সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রের ভুলব্যাখ্যাও রয়েছে, সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞতার জন্য, ফলে বিধানে রয়েছে পরস্পরবিরোধিতা (যেমন 'সঙ্গে' হবে কিন্তু 'সঙ্গীত' হবে না, হবে 'সংগীত'। সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে দুটি একই সূত্র বলে সাধিত)। আবার তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতিটিও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী। অগণতান্ত্রিক বলার কারণ পরে বলা হবে।

।। বহুরূপে সম্মুখে তোমার।।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুস্তিকাটির নাম রেখেছেন 'বানানবিধি', বানানবিধিতে বানান সংস্কার লিপিবদ্ধ হয় বলেই জানি, আকাদেমির কর্তাব্যক্তিরা লিপিকেও তার অন্তর্গত করেছেন। ইংরেজিতে বানান সংস্কারকে বলা বয় spelling reform, লিপি সংস্কারকে script reform । আমার স্বল্পবিদ্যায় এদুটি ধারণা এতোকাল আলাদা বলেই জানতাম, উভয়ই যে এক - তা আকাদেমির কল্যাণে জানা গেছে। এও জানতাম যে বানানবিধিতে শুধুমাত্র বানানের সংস্কার হয়, লিপির সংস্কার হয় না বা কররা হয় না। (এ আবার বানান তথা লিপিবিধিই নয়, উচচারণ- বিধিও বটে। কোন শব্দ কিভাবে উচচারণ করবেন তারও হদিশ দেওয়া হয়েছে। যেমন 'তাবড় তাবড়' -কে 'তাবড়ো' বলতে হবে এমন ফরমানও জারি করা হয়েছে। ছেলেবেলায় পড়া নোট - বইয়ের মতো একেবারে একের ভিতর তিন!)
।। স্বচ্ছতার উৎস সন্ধানে।।
বাঙলা লিপির সংস্কারের কথা প্রথম বলেছিলেন উনিশ শতকে একজন অজ্ঞাতনামা লেখক, বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (১৮৯৭)। তিনিও শিশুদের জন্য চিন্তিত ছিলেন। এবং তিনি যে সমস্ত যুক্ত ব্যঞ্জন এবং যুক্তাক্ষর (ব্যঞ্জন + স্বরবর্ণ) অস্বচ্ছ তা নতুনভাবে শেখার এবং স্পষ্ট করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে বা তার পরবর্তী কালে এ বিষয়টিকে কেউ আমল দেন নি বলেই জানি। (বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণমালা সংস্কার করেছিলেন বহু পূর্বে, ১৮৫৫ সালে।) কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙলা বানান তথা লিপি নিয়ে ভাবিত ছিলেন। তিনি বহু লেখালেখি, পরীক্ষা -নিরীক্ষাও করেছিলেন। তিনি লিপির সংস্কারও করেছিলেন, সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত তাঁর পুস্তকে তার প্রয়োগও করেছিলেন (১৯১৩ - ১৪)। তিনি কিছু যুক্ত ব্যঞ্জনকে স্বচ্ছ করেছিলেন, কিছু 'কার' -এর চিহ্ পরিবর্তন করে একরূপতা আনার প্রয়াস করেছিলেন, যেমন উ-কার, ঊ - কার, এবং ঋ - কারে সর্বক্ষেত্রেই একভাবে ব্যবহার করেছিলেন। সবগুলোকেই তিনিই নিয়ে এসেছিলেন অক্ষরের নীচে। আকাদেমি এ -সব তাঁর কাছ থেকেই নিয়েছে। আকাদেমির কর্তাব্যক্তিরা আনন্দবাজারের লিপিসংস্কারের কথা বলতে পঞ্চমুখ, আনন্দবাজারেও এ রকম করা হয়েছিল, এ কথা তাঁরা প্রকাশ্যে বলে বেড়ান। কিন্তু যোগেশবাবুর কথা কোথাও একবারের জন্যও বলার প্রয়োজন বোধ করেন নি। যুক্ত ব্যঞ্জনের যে রূপ আকাদেমিপ্রবর্তন করেছেন, তা-ও তাঁদের নিজস্ব নয়, সবই যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি করে গেছেন। যুক্তাক্ষর ভাঙার খেলায়আনন্দবাজার পত্রিকা লাইনোটাইপ প্রবর্তনের পরে একটু অন্যভাবে হাফবডি তৈরি করে। সেখানেও বিদ্যানিধি মহাশয়কে অনুসরণ করা হয়, অথচ তাঁর অবদান কোনো স্বীকৃতি পায় নি। যোগেশবাবু যে হাফ বডির ব্যবহার করেছিলেন, তাঁর স্থ, কিবা ট্র দেখলেই তা বোঝা যাবে। পরবর্তীকালে আনন্দবাজার প্রবর্তিত লাইনোটাইপের কল্যাণে যুক্তাক্ষর এমন হয়ে যায় তা দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠতে পারে নি। সুরেশ মজুমদার প্রমুখ শিব গড়তে চেয়েছিলেন বটে কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। লাইনোটাইপে যুক্ত অক্ষর হলেই তা একে অপরের দূরবর্তী হয়ে যায়।

অক্ষরমালার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনেই এমন করতে হয়েছিল। যেমন, পূর্বে ক্ + উ ছিল কু, (ছিল একটি টাইপ) লাইনোটাইপে তা হল কু (দুটি স্পেস), মূল অক্ষর থেকে কিছুটা দূরে ছিল 'কার' -এর অবস্থান। তেমনি হ+ ঋ হত হ 'কার' -এর ওপরেথাকত একটি মাত্রা। এমন পরিবর্তন বৈপ্লবিক বটে তবে কোনোমতেই নান্দনিক বলা যাবে না। এতে স্বচ্ছতা এসেছিল বটে, সৌকর্য আসে নি। ছাপতে দুগুণ জায়গা নিত। একটি যুক্ত - অক্ষরের জন্য দুটি স্পেস। পরে আনন্দবাজার তা পরিহার করে পুরোনো ফন্টে চলে আসে, যাকে প্রেসের চালু কথায় বলা হয় 'মাদার ফন্ট' বা 'বিদ্যাসাগরি ফন্ট'। সে কথায় পরে আসব। যোগেশবাবুর ফন্ট সাহিত্য পরিষৎ -ও গ্রহণ করে নি। স্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়, আকাদেমির ডুবুরিরা তা আবার তুলে আনেন, এবং নিজেদের বলে চালান! যোগেশবাবু শুধুমাত্র ঞ্ + ছ (= ঞ্ছ), ঞ + জ (= ঞ্জ)- কে পরিবর্তন করেন নি, আকাদেমি তাঁকেই অনুসরণ করে এ দুটো যুক্ত ব্যঞ্জনকে ওপর - নীচে রেখেছে যেমন করেছে ঞ্চ-র বেলায় (ঞচ)। যোগেশবাবু স্বচ্ছতার দিকে বেশি নজর দিয়েছিলেন, যুক্তব্যঞ্জনকে কার্নিং (Kerning) করে পাশাপাশি নিয়ে এসেছিলেন, যেমন দ্+ ধ হয়েছিল দ্ধ, এরকম বা আরেকটু কাছে। দুটি ব্যঞ্জনই কিন্তু স্পষ্ট এবং বোধগম্য।

।। স্বচ্ছতা কাহারে কয় ? ।।

পন্ডিতেরা স্বচ্ছতা নিয়ে ভাবিত। এমনই ভাবিত যে তাঁদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটার উপক্রম। স্বচ্ছতা অবশ্য পন্ডিতেরা যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেই ভাবছেন (যুক্ত ব্যঞ্জন বলতে এখানে 'কার'- যুক্ত এবং ব্যঞ্জন + ব্যঞ্জন -কে বোঝানো হচ্ছে)। কিন্তু বাঙলা বর্ণমালার পুরো চেহারাটা যে আদৌ স্বচ্ছ নয়, তা একবারের জন্যও খতিয়ে দেখেন নি। যেমন ধরা যাক বাঙলার কিছু একক ব্যঞ্জন। যে সমস্ত বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণ (অর্থাৎ প্রতি বর্গের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বর্ণ) বলা হয় তা আদতে 'স্বচ্ছ' বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে খ এবং ঘ-র মহাপ্রাণতা লুপ্ত হলে তা পরিণত হয় যথাক্রমে ক এবং গ-এ। খ এবং ঘ আদতে ক + হ (খ, ঘ, ছ, ঝ, ফ, ভ সমস্ত মহাপ্রাণ বর্ণই মূলে যুক্ত বর্ণ। আবার নাসিক্য বর্ণের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখি যে প্রতি বর্গের শেষে একটি করে নাসিক্য বর্ণ আছে ঙ, ঞ, ন, ণ, ম। ঙ কণ্ঠ্য, ঞ তালব্য, ন দন্ত্য, ণ মূর্ধন্য, ম ওষ্ঠ্য বর্গের অন্তর্গত। অর্থাৎ ঙ হল কণ্ঠ্যন, ঞ তালব্য ন, ম ওষ্ঠ্য ন ( যেমন ধন, লি - ন্ - প - তি হয় লিম্পতি; সব ভাষাতেই এমন ধরনের পরিবর্তন প্রতিবেশ বিশেষে হয়।) এগুলো কি যথেষ্ট স্বচ্ছ ?

বাঙলা বর্ণরূপের দিকে একবার তাকানো প্রয়োজন। বাঙলা যুক্ত ব্যঞ্জনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা অন্তত তিন রকমের স্বচ্ছ, অর্ধ - স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ।

স্বচ্ছ যুক্ত ব্যঞ্জন তাকেই বলব যাতে দুই বা ততোধিক বর্ণের সম্মিলনে বর্ণের উভয়ের আকৃতি সহজবোধ্য, একক বর্ণের মতো অবিকল না হলেও। বিভিন্ন ফলা - যুক্ত ব্যঞ্জনে যেমন ম- ফলা, ব-ফলা, ন - ফলা, ণ-ফলা, লঃফলা ইত্যাদিতে যেমন ক + ব = ক্ব, গ+ ব = গ্ব, দ+ ব = দ্ব, দ+ দ = দ্দ; ত + ম = ত্ম, দ + ম = দ্ম, হ + ন = হ্ন, হ + ণ = ইত্যাদি। এ সব ক্ষেত্রে দুটি বর্ণকে শনাক্ত করতে অসুবিধে হয় না, যদিও বর্ণের চেহারার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়। ত + ম (ত্ + ম = ত্ম) - এর ত-র চেহারার বৈলক্ষণ্য হয় নি বটে, ম একটু রূপ পরিবর্তন করেছে, আবার দ্দ -এর উভয়কে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে একটু সমস্যা আছেই, হ + ন = হ্ন, হ+ ণ = ইত্যাদি।

অর্ধ - স্বচ্ছ যুক্ত ব্যঞ্জনে একের চেহারা অপরিবর্তিত থাকলেও, অপরের চেহারা একেবারে অন্য রূপ নেয়।তিন ধরনের যুক্ত ব্যঞ্জনে য - ফলা - যুক্ত, রেফ - যুক্ত, র - ফলা - যুক্ত (অধিকাংশ) ব্যঞ্জনে একের আকৃতি অপরিবর্তিত থাকে, যেমন ক + য = ক্য, গ + য = গ্য, র + ক = র্ক, র + ঘ = র্ঘ, গ + র = গ্র, ঘ + র = ঘ্র, প + র = প্র(র - ফলাযুক্ত, ক্র, ত্র, ভ্র - কে এখানে বাদ দিচ্ছি! এগুলো 'অস্বচ্ছ' বা আরো যুক্তিযুক্তভাবে বলাযায় প্রতীয়মান অস্বচ্ছ যুক্ত ব্যঞ্জনের আওতায় পড়ে বলে এগুলোকে কিন্তু পুরোপুরি অস্বচ্ছ বলতে দ্বিধা হয়। র - ফলাকে খুঁজে পেলেও পূর্ব ব্যঞ্জনকে খুঁজে পেতে বার করা যায়, অবশ্য দেখার চোখ দরকার। আধুনিক ধবনিতত্ত্বের পরিভাষায় একে বলে telescoping )। দূর - নিরীক্ষণ করলে বর্ণের রূপ ধরাপড়ে।

পুরোপুরি অস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জনগুলোতে দুটি ব্যঞ্জনের চেহারা আলাদা করে ধরা যায় না, বিবর্তনের পথে তা এমন হয়েছে যে তা এক নতুন রূপ নিয়েছে যেমন, ঙ্গ, জ্ঞ, হ্ম, ক্ষ। পূর্বেই বলেছি ক্র, ত্র, অস্বচ্ছ হলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না, র - ফলা রয়েছে, ক - র ডান দিকের আঁকড়ি রয়েছে, ত্র - র ক্ষেত্রেও তাই। একটু চেষ্টা করলেই ত এবং র - ফলা আবিষ্কার করা যায়। জ্ঞ - কেও বুঝতে অসুবিধে হবার কারণ নেই! স্পষ্টতই জ রয়েছে সেখানে, ঞ তারউপস্থিতি ঘোষণা করছে ড

ানদিকের পুটুলি ও-- দিয়ে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে বাঙলা হ্ম আদতে কিন্তু ম্ + হ্ , প্রাচীন বাঙলায় 'আম্হে' লিখতে 'আম্মে' লেখা হয় আমরা হ্ম - কে উচচারণ করিও হ + ম হিশেবে নয়, মূলত ম্হ হিশেবে, যেমন 'ব্রাহ্ম', উচচারণে তা দু রকম হয়, 'ব্রাম্হো' অথবা সমীভবনের ফলে 'ব্রাম্মো'।

লিপির স্বচ্ছতার জন্য বানান - বিপ্লবীরা কোমর বেঁধে নেমেছেন শিশুকে সহজ করে বর্ণপরিচয় করাবার জন্য। তাঁরা অল্প কয়েকটি যুক্তাক্ষরকে শনাক্ত করে তা 'স্বচ্ছ' করার প্রয়াস করেছেন। অস্বচ্ছ থাকলে নাকি শিশুর ভাষা শিখতে অসুবিধে হয়। (যে - সমস্ত পন্ডিতজন এ সব করেছেন, তাঁদের তো কোনো অসুবিধে হয় নি! এটা তাঁরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন। ) প্রথমে তাঁদের তালিকায় 'অস্বচ্ছ' যুক্তব্যঞ্জন ছিল ১৫টি, ২০০৩ সালে দাঁড়িয়ে তাঁরাঅনুভব করলেন আরো কয়েকটি যোগ করা যায়, হল ২১টি (পরে হয়তো আরো কিছু যোগ হবে কারণ ক্রমশ তা বাড়ছে, যদি না তাঁদের এই তুঘলকি ক ান্ড মাঝপথে পরিত্যাগ করতে হয়)। ভাবখানা এমন বাঙলা ভাষাতে ওই কয়েকটি যুক্তাক্ষরই 'অস্বচ্ছ' আর সব স্ফটিকস্বচ্ছ, কোমলমতি শিশুর তাতে অসুবিধা হওয়ার কোনো কথাই নয়। (শিশুদের ইংরেজি ভাষা শিখতে অসুবিধে হয় বলে, তাকে বিদায় দেওয়া হয়েছিল নীচু ক্লাস থেকে। পরে আবার তাকেপুনর্বহাল করতে হয়েছে, সেও শিশুর কথা ভেবে!) 'স্বচ্ছ' করে ফেলেই তাঁরা ভাবলেন হল অনবদ্য। একুশটি যুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে (ভেঙে; ভেঙে বলা যাবে না, তাঁরা না ভেঙে গড়েছেন!), তাদের আকৃতি বদল করেছেন! নতুনচেহারা দিয়েছেন। আবার এটা যে নতুন কিছু নয়, তা তাঁরা জানান নি। আসল কথা চেপে গিয়ে তাঁরা বলেছেন লাইনোটাইপেও তো এরকম হয়েছিল! আবার তা বার বার পাল্টাচ্ছেনও বটে। কেমন করে তাঁরা বার বার পরিবর্তন করছেনতা আকাদেমি - মোহমুক্ত (যদিও এককালে প্রচন্ড ভক্ত ছিলেন) অশোক মুখোপাধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকায়একটিলেখায় তার তালিকা তথা সারণি করে দেখিয়েছেন। তাঁদের হরফ - নির্মাতারা মার্কসীয় তত্ত্বের অন্য কিছুতে বিশ্বাস না কন এটুকুতে বিশ্বাস করেন যে একমাত্র পরিবর্তনই অপরিবর্তনীয়। আর সেই যুক্ত ব্যঞ্জনগুলি 'স্বচ্ছ' করেছেন তার অনেকগুলি পড়তে এবং সঠিক ভাবে বুঝতে আতশ কাছের প্রয়োজন হবে অথবা তা ৭২ পয়েন্ট ফন্টে ছাপাতেহবে। বিদ্যানিধি মহাশয় এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন, তাঁর কান্ডজ্ঞানের সঙ্গে এঁদের তুলনা করে তাঁকে হেয় করতে চাই না। উচিত হবে না। তিনি সত্যিকারের স্বচ্ছ যুক্তাক্ষর করতে পেরেছিলেন, কিন্তু লোকে তা নেয় নি, বা অজ্ঞাতই থেকে গেছে। তবে আকাদেমির 'স্বচ্ছতা' তুলনারহিত। একটি বর্ণ অপরটির ঘাড়ে, মাথার উপর, পেটের উপর, বুকের ওপরে, এমনভাবে দাঁড়িয়ে বা হেলে রয়েছে যে বোঝার কোনো জো নেই। স্বচ্ছতার দোহাই দিয়ে বাঙলা যুক্ত ব্যঞ্জনের যে সরলীকরণ (অর্থাৎ আকৃতি বদল) হয়েছে তাতে বর্ণের নান্দনিক রূপ উধাও হয়ে গিয়েছে, যা হয়েছে তা কুৎসিত এবং কদর্য। সৌকর্যের কোনো বালাই নেই। তা যে দৃষ্টিনন্দন নয় তা বানানবিধির প্রণেতারাও প্রকারান্তরে স্বীকার করে বলেছেন যে "লিপিরূপ - বিশেষজ্ঞরা ... এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে সুষম ও সুন্দর রূপ নির্মাণ করবেন"। তাহলে কী ধরে নিতে হবে কোনো হাতুড়েকে দিয়ে এই লিপি করানো হয়েছিল? অথচ কলকাতায় লিপি - বিশেষজ্ঞের অভাব নেই, এ বিষয়ে পন্ডিতজনেরাও রয়েছেন। বাঙলা যুক্ত ব্যঞ্জন যেমন ন্থ (অর্থাৎ ন্ + থ) স্থলে আকাদেমি প্রবর্তিত যুক্ত ব্যঞ্জনটি (ন্থ)। সেখানে স্বচ্ছ থ-র মাথায় অর্ধেক ন যেভাবে হেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মনে হয় তা পড়ে গেল বলে। তেমনি ব্ধ স্থলে প্রবর্তিত লিপি (বধ) শিশুদের কাছে তা নাকি সহজবোধ্য হবে! অনেক ক্ষেত্রে লিপি রূপ এমনই যে তা উদ্ধার করার জন্য ব্যোমকেশ বক্সীর প্রয়োজন হতে পারে। মনে হয় উনিও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসবেন। অসাধারণ কীর্তি!

তাঁদের একুশটির বাইরেও বহু যুক্ত ব্যঞ্জন রয়েছে যা 'স্বচ্ছ' নয়, যেমন ক্ষ, ট্র, ক্ত, ক্র, হ্, , ভ্র, থ্ ইত্যাদি। আরো অনেক যুক্ত ব্যঞ্জনকে তাঁরা সরল করেন নি, কারণ তাতে 'জটিলতা' বাড়বে। যেগুলো তাঁরা করেছেন তাতে জটিলতা না বেড়ে একেবারে কমে গিয়ে শূন্যে দাঁড়াবে! তাঁদের ধারণা অল্প কিছুকে। 'সরল' করলে জটিলতা আদৌ বাড়ে না। যাই হোক, বিদ্যানিধি মহাশয় ট্র - কে করেছিলেন, উপরে ট, নীচে একটি ছোটো ট। তা এঁদের নজরে আসে নি, বা করতে পারেন নি। বিদ্যানিধি মহাশয় পেরেছিলেন। ক্ষ এবং জ্ঞ-এ আকাদেমি হাত দেন নি কারণ তাদের ক্ষেত্রে "পৃথক ও পরস্পর (sequential) উচচারণ না হয়ে অন্য একটি উচচারণ" চলে আসছে। এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে অন্য অনেক যুক্ত ব্যঞ্জনে (ম - ফলা যুক্ত, য - ফলা - যুক্ত ইত্যাদি) কি তার নিজস্ব উচচারণ বহাল থাকে? যেমন, দ্ম, ত্ম, স্ম, ক্য ইত্যাদি। আকাদেমির কর্তারা ভেবেছেন এতে শিশুদের কোনো অসুবিধে হবে না! কয়েকটিকে 'স্বচ্ছ' করা হবে, তাতে শিশুদের সুবিধে হবে, বাকিগুলি 'অস্বচ্ছ' থাকলে শিশুদের কোনও অসুবিধে হবে না। এখানেও জিজ্ঞাসা চিহ্ন থেকে যায়, এ কোন

ধরনের বৈজ্ঞানিক তথা ভাষিক যুক্তি? এ তো কোনো কান্ডজ্ঞানের পরিচয় নয়। স্বচ্ছতার পক্ষে তাঁদের যুক্তি যে শিশু যেমন লিখবে তেমন পড়বে। ন্ড(দন্ত্য ন্ + ড), এবংণ্ড(ণ + ড) উচ্চারণে তো এক ! যোগেশবাবু দুটিকে আলাদা করার প্রয়োজন বোধ করেন নি, শুধু মূর্ধন্য ণ যাতে ভালোভাবে বোঝা যায় সেভাবে হরফ তৈরি করিয়েছিলেন। আলাদাভাবে লেখার ক ারণ আকাদেমির বিপ্লবীরা দিয়েছেন। বেশ ভালো কথা। ধবনিতাত্ত্বিকেরা তো বলেন দন্ত্য ন মূর্ধন্য - র ঘাড়ে চাপলে তা অ াপনা - আপনিই উচ্চারণে মূর্ধন্য ধবনিতে পরিণত হয়ে যায়। ষ্ণ - কে তাঁরা ভেঙে করেছেন ষন। ষ্ণ -তে উচ্চারণে মূর্ধন্য ষ এবং ণ থাকে? তা তো বদলে গিয়ে একেবারে অন্য রকম উচ্চারণ হয়। তা বলে তাকে ভাঙার কি দরকার? লিখি বিষ্ণু, উচ্চারণ করি 'বিশ্‌নু', ষ্ণ-র পিঠে যে 'পুটুলি' -টি আছে তা নিশ্চিতভাবেই তালব্য উচ্চারণেৰ দ্যোতক। ভাষাতাত্ত্বিক বিচ ারে তালব্য ন হল ঞ। এ কথা মানতে বোধহয় কার বাধা নেই। (প্রয়াত প্রবোধ চন্দ্র সেন তাই তালব্য ন চিহিত করতে 'ন্ঁ' -এর প্রস্তাব করেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয়' -তে গত শতকের ছয়ের দশকে)। আবার 'স্বচ্ছ' যুক্তাক্ষরই কি যথেষ্ট উচ্চারণে 'স্বচ্ছ'? অল্প কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন ত্ম, দ্ম, কৃ, ত্ব, দ্ব, ধব, স্ব, ষ্ম ('উষ্ম' - তে নয়, 'গ্রীষ্ম', 'ভীষ্ম' ইত্যাদিতে; 'উষ্ম' -তে তো তালব্য উচ্চারণ?) স্ম (বিস্ময়, স্মিত, স্মরণ)। য-ফলা - যুক্ত ব্যঞ্জন তো শব্দের আ দিতে একরকম উচ্চারণ, শব্দমধ্যে আরেকরকম। শিশুদের চিন্তায় যাদের আহার - নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে তাঁরা কি এই - সব ভেবে দেখার অবকাশ পেয়েছেন? বাঙলা ভাষার জন্য বলিপ্রদত্ত এবং শিশুদের জন্য অহোরাত্র চিন্তক পন্ডিতেরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন কি যে শিশু ইস্কুলে শিখবে এরকম বানান।আবার সে শিশুকেই তার প্রাত্যহিক জীবনে অন্য বানানের সম্মুখীন হতে হবে। সেই শিশুকে আবার নতুন করে বর্ণপরিচয় করতে হবে। বাড়ির লোককে বা অভিভাবককে জিজ্ঞেসা করবে ত্ত, ত্র, গ্ধ, ঙ্ক, ঞ্চ, ঞ্জ, দ্ধ, ন্ধ, ব্ধ, ষ্ণ, স্থ,ক্ষ্ম কি? এ - সব অচেনা হরফ তো তাদের ইস্কুলের কোনো প াঠ্যপুস্তকে নেই, শেখানোও হয় নি? তার অভিভাবক তাকে কি জবাব দেবে জানি না। বলবে হয়তো ইস্কুলের বানান এক রকম, আর ঘরের বানান আরেক রকম? ইস্কুলেএকলিপি, অন্যত্র আরেক লিপি। ভিন্ন প্রতিবেশে ভিন্ন বানান। সেই বেচারা কিভাবে বাঙলা সংবাদপত্র পড়বে (যে সংবাদপত্রই তার বাড়িতে রাখা হোক না কেন)? কোনো সংবাদপত্রেই তো এর স্ বীকৃতি নেই। অনুসরণও করা হয় নি। রাজশিক্তর সংবাদপত্রেও নয়! সেখানে তো কোনো বানানরীতির বালাই নেই। সে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ বাসুকান্ত কেমন করে পড়বে! এ-সব বইপত্তর তো মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ফতোয়া মেনে ছাপ ানো হয় নি, হবেও না।ভাবলে শিউরে উঠতে হয় যে বিগত পাঁচ বৎসরে কত লক্ষ শিশুর সর্বনাশ হয়েছে। তাদের দ্বিতীয় বার বর্ণপরিচয় করতে হয়েছে। আগামী বছরগুলিতে আরো কত শিশুর সর্বনাশ করার জন্য তাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন। পর্ষদ বা সংসদকেতো উপরওয়ালার নির্দেশ পালন করতেই হয়, অর্থাৎ 'উৎসাহ' দেখাতে হয়!

বাঙলা ভাষাটা কার ?

এহ বাহ্য। প্রশ্ন করা যায় বাঙলা ভাষাটা কার? বাঙলা ভাষাটা পশ্চিমবঙ্গের একার বা এপার বাংলার বা ওপার বাংলা কো ানো আকাদেমির গোষ্ঠীগত সম্পত্তি নয়। অল্প কয়েকজন ব্যক্তিরও নয় যে তাঁরা তাঁদের খেয়ালখুশিমতো যা ইচ্ছে তাই করবেন। তা ২৩ কোটি বাঙালির প্রাণের ধন। বাঙলা ভাষার জন্য যাঁদের নিবেদিত প্রাণ তাঁরা বিলক্ষণ জানেন যে এই ভ াষাটা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই বলা হয় না, বাংলাদেশের একমাত্র ভাষা (রাষ্ট্রভাষাও বাঙলা সেখানে; তাঁরা এ ভাষার জন্য শহিদ হয়েছেন। মাতৃভাষার জন্য তাঁদের বলিদানকে সম্মান জানিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিশেবে স্বীকৃত হয়েছে।) বরাক উপত্যকার কাকারেও বাঙালিরা রয়েছেন, তাঁরাও এই বাঙলা ভাষার জন্য রক্ত ঝরিয়েছেন (১৯ মে ১৯৬১)। আমরা এপার বঙ্গে ২১ ফেব্রয়ারি এবং ১৯ মে - কে স্মরণ করি, অপর এক দেশের এবং আমাদের দেশের এবং আমাদের দেশের প্রতিবেশী এক রাজ্যের অঞ্চলের বাঙলা ভাষীদের জন্য। ত্রিপুরার অন্যতম ভাষাও বাঙলা ভাষা। ঝাড়খন্ডেও বাঙলা ভাষার বিদ্যালয় আছে, বাঙলা ভাষীও আছেন। বানান তথা লিপি - সংস্কারে কিন্তু এঁদেরও কোনো ভূমিকা নেই, এঁরা অন্ত্যজ। এঁদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে কিছু ঠিক করা হয় নি, তাই আশর্চ্য হবার কিছুই নেই। যাঁদের ভূমিকা ব্যাপক এবং বিশাল তাঁরা কোনো একটি রাজনৈতিক দলের অনুগত পন্ডিত ব্যক্তি তাঁদের ললাটে জ্বল - জ্বল করে রাজটীকা। এবং তাঁরা এলিট নন, সর্বহারা! কারণ এলিটিস্ট শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। এ - সব সর্বহারার ললাটে রাজটীকা বলেই তাঁদের কথাই শেষ কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভাষাতত্ত্ব বিভাগ অ াছে, আকাদেমির কর্তাদের চরণতলে আত্মনিবেদিত অনেক ভক্ত সেখানে আছেন, তাঁদেরও কোনো ঠাইঁ হয় নি এই বানান

সংস্কারে। ভত্তদের প্রতি এমন অন্ - আস্থা ?

বানান সংস্কারের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ

আকাদেমির সচিব একটি টিভি দূরভাষ - সংলাপ (ফোন-ইন) অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন যে বানান সংস্কারের ব্যাপারে তাঁরা ব াংলাদেশের পন্ডিতদের ডেকেছিলেন। তাঁদের অনেকের কাছে ভিত্তিপত্রও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের পন্ডিতেরা যঁ ারা বানান নিয়ে ভাবিত তাঁরা কেউ সাড়া দেন নি। সঙ্গত কারণেই সাড়া দেন নি। কেনই বা দেবে? তাঁরা মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে এক ফোঁটাও রক্ত ঝরে নি বাঙলা ভাষার জন্য। রক্ত নাঝরিয়ে যে কাজ করা যায় সে কাজ অর্থ াৎ সরকারি স্তরে পর্যন্ত বাঙলা ভাষা চালু করা যায় নি। পশ্চিমবঙ্গের মুষ্টিমেয় কিছু লোক মাতববরি করবে আর সেই ম াতববরদের তাঁরা মেনে নেবে, এ অন্যায় আবদার। আকাদেমির সচিবের অহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁরা ঘোরতর অন্যায় ক াজ করেছেন ! বস্তুত এ কাজ করা উচিত ছিল সম্মিলিতভাবে। বলা উচিত ছিল আসুন আমরা সকল বাঙলাভাষীরা মিলে, বসে বাঙলা ভাষার সমস্যার সমাধান করি। যেহেতু আমাদের ভাষা বাঙলা ভাষা, আপনাদেরও ওই একই ভাষা, তাই সমস্যা আমাদের একার নয়, সমস্ত বাঙলা ভাষীদের। তাই সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। তা করা হয় নি। ভিত্তিপত্র স ম্পর্কে তাঁদের মতামত চাওয়া হয়েছে মাত্র। তাঁরা কী অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তা কার জানার উপায় নেই। আক াদেমির সচিব সত্যি কথা বলছেন কিনা তা -ও যাচাই করার কোনো উপায় নেই।

আরো বড়ো কথা মুষ্টিমেয় কয়েকজন পন্ডিত মিলে একটি ভিত্তিপত্র তৈরি করে তা বিলি করেছেন আকাদেমি। তার ভিত্তিতে বানান সংস্কার করা হয়েছে। সংস্কারের জন্য কোনো সমিতি গঠিত হয় নি। হলেও তা চারের দশকের রনদিভের অ ামলের কমিউনিস্ট পার্টির মতো ছিল আন্ডারগ্রাউন্ড সমিতি। পুস্তিকায় সচিব কয়েকবার 'বানান সমিতি'র কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁরা কে বা কারা জানানো হয় নি। কিন্তু কয়েকজনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা বলাহয়েছে পুস্তিকাটিতে। 'বান ানবিধি' পুস্তিকায় সমিতির কোনো হদিশ মেলে না। বানান সমিতি বলে যদি কোনো বস্তুথেকে থাকে, তবে তা তো সমিতিরই কাজ, আলাদাভাবে কয়েকজনের সাহায্য নেওয়ার কথা তো সেখানে আসতে পারে না। 'বাংলা বানানবিধি' (আগস্ট ২০০৩) পুস্তিকার সর্ব শেষ সংস্করণেও কোনো বানান সমিতির উল্লেখ নেই। সব সময় হয়ে গেছে তখন দেখা গেল একটি বানান সমিতি গঠিত হয়েছে, বা এর উল্লেখ রয়েছে! তা জানতে পারি 'আকাদেমি বানান অভিধান' (২০০৩) নামক পুস্তকে। সাধারণ জানতে পারলেন যে ঘোড়ার আগে এতদিনে গাড়ি জোড়া হল। এতদিন হয়তো বানান সমিতির ওপর ব্যান বা নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা উঠে গেছে। যা জনসাধারণের অগোচরে ছিল, তা এবার প্রকাশ্যে এল। আকাদেমির কর্তারা বানানবিধি পুস্তিকায় তা জানাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। 'আকাদেমি বানান অভিধান' -এ যে সমিতির উল্লেখ আছে তাই তো 'বাননবিধি' পুস্তিকায় থাকতে পারত অল্প কয়েকজনের নামোল্লেখ না করে? আর যদি সমিতি থাকে তা তে া সেই বানান সমিতির সুপারিশ? অল্প কয়েকজনের নামোল্লেখ সাহায্যকারী হিসেবে সেখানে অবান্তর, তাঁরাও তো সমিতির অন্তর্গত। এর কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না।

অন্য দিকে দেখা যাক কলিকাতা ঝিবিদ্যালয়ের বানান সমিতি কিভাবে গঠিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বাঙলা বানানে শৃঙ্খল ার অভাব অনুভব করে শৃঙ্খলা আনার জন্য কলিকাতা ঝিবিদ্যালয়কে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেছিলেন। (রবীন্দ্রনাথ সে সময় কলকাতা ঝিবিদ্যালয়েৰ বাঙলা বিভাগে পড়াতে এসেছিলেন।) তাঁর মতে ঝিবিদ্যালয়ের যে মান্যতা আছে তা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের নেই। তিনি কিন্তু তাঁর সময়ে দাণভাবে জীবন্ত প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে সঙ্গত কারণেই উদ্যোগ নেবার জন্য অনুরোধ করেন নি। কারণ তা বিদ্বৎসভা বটে, তার মান্যতাও ছিল বটে, কিন্তু কোনো authority ছিল না যা কলিকাতা ঝিবিদ্যালয়ের ছিল। একথা বুঝতে পেরেই তিনি কলকাতা ঝিবিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। কলকাত া ঝিবিদ্যালয়ের সেই মান্যতা এখনও অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তৎকালীন উপাচার্য মহাশয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বন ামধন্য পন্ডিতজন সমাবেশে একটি সমিতি গঠন করেন ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে। রাজশেখর বসু ছিলেন তার সভ াপতি। বানানের মান্যতা আনার জন্য দিনের পর দিন সমিতির অধিবেশন বসে। তুমুল বিতর্ক হয়। তার পরে তা একটি সর্বসম্মত সুপারিশ আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। মনে রাখতে হবে সালটি ১৯৩৬, অবিভক্ত বঙ্গদেশ, কলকাতা ঝিবিদ্যালয়েৰ সীমানাও বহুদূর বিস্তৃত। সুপারিশে স্পষ্ট লেখা ছিল "কলিকাতা ঝিবিদ্যালয় প্রকাশিত পুস্তকাদিতে নিয়ম াবলী সম্মত বানান গৃহীত হইলে ত্রমেত্রমে তাহা সুপ্রচলিত হইবে। কিন্তু সাধারণের অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে এবং ছ

াত্রগণও নিয়ম লঙঘন করিবে। সেজন্য এখন কয়েক বৎসর নিয়ম পালন সম্পর্কে কোনও প্রকার পীড়ন বাঞ্ছনীয় নয়।" 'পীড়ন' শব্দটি লক্ষণীয়। জবরদস্তি নয়, সাধারণের পক্ষে গ্রহণীয়তার কথাই তাঁরা বলেছেন। এটাই হল বানানবিধির গোড়ার কথা তথা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ। তা ছিল সুপারিশ মাত্র, জবরদস্তি নয় বা কোনো ফতোয়া জারি করে বানান মানতে বাধ্য করা নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকেও সেই বিধি। সুপারিশ সব সময় মানা হয় নি। গ্রহণীয়তার ওপরই তাঁরা জোর দিয়েছিলেন। সংস্কার - পরবর্তীকালে রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' বানান সমিতির সুপারিশ প্রকাশিত হয়। 'চলন্তিকা' পুরোনো হলেও, তার প্রামাণিকতা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

আর আকাদেমি কি করেছেন? আকাদেমি করেছেন বললে ভুল হবে (যদিও একথা জানি যাঁহাদের আকাদেমি তাঁহাদেরই পর্ষদ)। পর্ষদকে শিখন্ডি দাঁড় করিয়ে পেছন থেকে রথ পরিচালনা করেছেন আকাদেমিরূপী কৃষ্ণ। পর্ষদের অলিখিত ফতোয়া আকাদেমি প্রবর্তিত বানান না মানলে, বা লিপি বিশেষ একজনের নিকট থেকে কিনে বইনা ছাপলে তা বিবেচিতই হবে না! পর্ষদের এমন কোনো ফতোয়া দেবার বিধিবদ্ধ অধিকার আছে কিনা এমন প্রশ্নওতোলা যায়। ফন্ট একজনের কাছ থেকেই কিনতে হবে? এ কথা অবশ্য তাঁরা প্রকাশ্যে কবুল করেন নি, প্রকাশক আকাদেমিতে ফোন করলে, ফন্ট - কর্তার নাম বলে দিতেন। (অর্থাৎ যাহাই আকাদেমি তাহাই পর্ষদ।) এ কোন ধরনের কথা? ফন্টও আবার কয়েকদিন পর পর নতুন নতুন আকার ধারণ করে। (সে - কথা আগেই বলা হয়েছে।) তখনও প্রকাশককে আবার নতুন প্যাকেজ কিনতে হয়। আকাদেমির তুঘলকি মতি, প্রকাশকের ক্ষতি, ফন্ট - কারকের পকেট ভর্তি। এটাই আকাদেমির অন্যতম কীর্তি।

When will they ever learn ?

এই সংস্কারের প্রয়োজন কেন এই সম্পর্কে অনেক কথা শুনতে পাই। কেউ কেউ বলেন এলিটিজমের হাতথেকে বর্ণমালাকে সাধারণ স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্যই নাকি সংস্কারের প্রয়োজন। এতকাল শিক্ষাব্যবস্থা ছিল এলিটিস্ট, বানান সংস্কারের সঙ্গে তা হয়ে গেল প্রোলেতারীয়। খুব ভালো কথা। এলিটদের হাত থেকে শিক্ষার মুক্তি আমরাও চাই। কিন্তু যাঁরা এ সব কান্ড-কারখানা করছেন তাঁরা কি সব প্রোলেতারীয়? ঠান্ডা ঘরে থাকেন, ঠান্ডা গাড়িতে চড়েন। এর পরেও বোধহয় সর্বহারা থাকা যায়। আরেকজন পন্ডিত (!) সভা - সমিতিতে বলেছেন আর্থ - সামাজিকপরিবর্তনের জন্যই নাকি বানান সংস্কার প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট রাজত্বে আসার সঙ্গে সঙ্গে নাকি 'আর্থ - সামাজিক পরিবর্তন' হয়ে গেছে! আমাদের পন্ডিতপ্রবর আর্থ - সামাজিক কথাটা বোধহয় তিনি নতুন শিখেছেন! হায় রে মার্কসবাদের জ্ঞান ! তাঁর জ্ঞাতার্থে জানাই যে সংসদীয় পথে নির্বাচনে এক দলের জায়গায় আরেক দল ক্ষমতায়এলে আর্থ - সামাজিক পরিবর্তন হয় না। মার্কস কবরে শুয়ে হাসবেন, না কাঁদবেন জানি না। সংসদীয় পথে এক দলের জায়গায় আরেক দল ক্ষমতায় এলে শোষণ যন্ত্র টিকেই থাকে, শোষণের মাত্রাও কমে না। যন্ত্র একই থাকে যন্ত্রী পাল্টায় মাত্র। শোষণের হাতিয়ার ঠিকই থাকে। আর্থ - সামাজিক পরিবর্তন তখনই হয় যখন শোষণ - যন্ত্র আর থাকে না। সাম্প্রদায়িক (এবং বর্বর) বিজেপির নির্বাচনে পরাজয় এবং বাম - সমর্থিত (এবং সোনিয়া - চালিত) নতুন সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আর্থ - সামাজিক পরিবর্তন হয়ে গেছে বলতেই হবে! সিদ্ধার্থশঙ্করের পরে তাঁর বন্ধু এবং তার পরে সিদ্ধার্থর নব অবতার (নামে এবং কাজে, উভয়েই) ক্ষমতায় আসাতে কোনো সামাজিক তথা অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয় নি, হতে পারে না, কারণ ভিত্তি তো একই থাকে। ভিত্তি না বদলালে উপরি - সৌধও বদলায় না। ভিত্তি বদলায় বিপ্লবে, সংসদীয় পথে নয়। শ বিপ্লবের পরে শ ভাষা কি বদলে গিয়েছিল? সেখানে তো সমাজের আমূল পরিবর্তন হয়েছিল অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তন হয়েছিল। (এ নিয়ে স্তালিনের সঙ্গে এন। ওয়াই। মারের বিতর্ক স্মরণীয়।) না, তার পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন হয়েছিল? অথবা চীন বিপ্লবের পর? ৬০ হাজারের ওপর ভাবলিপি সংস্কারের কথা একবারও ভাবা হয় নি সেখানে। শিশু তো তা ঠিকই শেখে। ওই দুই আর্থ সামাজিক পরিবর্তন হয়েছিল বিপ্লবের পথ ধরে, সংসদীয় ঠান্ডা ঘরের পথে নয়। পিট সিগারের বিশ্ববিখ্যাত গানের (where have all the flowers gone? ) একটি কলি স্মরণীয় When will they ever learn ?

জর্মন ভাষার বানান সংস্কার

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি উদাহরণের উল্লেখ বোধকরি অবান্তর হবে না। জর্মন ভাষার বানান সংস্কারের প্রয়োজন বহুকাল থেকেই অনুভূত হচ্ছিল। পাঁচের দশকে যখন এমন কথা ভাবা হচ্ছিল, প্রয়াসও হয়েছিল, তখন বিখ্যাত সাহিত্যিক টমাস মান তার তীব্র বিরোধিতা করেন। তার পর বহুদিন কেউ সংস্কারের প্রয়াস করেন নি। আটের দশকে সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হয়, সেই ভাষার বানানের কিছু অঞ্চল শনাক্ত করা হয়, জর্মন দেশের হাতে - গোনা রাজ - ভক্ত কয়েকজন পন্ডিত

মিলে তা করেন নি। জর্মন ভাষী যুক্ত জর্মনি, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, লিখটেনসটাইন, এবং যেই - সব দেশে জর্মন ভাষী আছেন, সেই সব দেশকে নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিশন গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ কমিশনের ১০ বৎসরের শ্রমের পর জর্মন ভাষার সংস্কারের সুপারিশ করে ১৯৯৬ সালের ১লা জুলাই ভিয়েনাতে। স্মরণ করা প্রয়োজন ভিয়েনা অষ্ট্রিয়াতে। তাঁরা যে সংস্কারের বিধান দেন ১৯৯৬ সাল থেকেই তা বলবৎ হবে বলে ঘোষণাও করা হয়। জর্মানির কোনো রাজ্য তা চালু করে দেয়। এ নিয়ে আদালতি মামলাও হয়। প্রদেশের সরকার মামলায় হারে। গণভোটও হয়, তাও সংস্কারের বিপক্ষে যায়। জর্মনির অধিকাংশ মানুষই সংস্কারের বিপক্ষে।অষ্ট্রিয়ার দুই - তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ সংস্কারের বিদ্ধে। বেগতিক দেখে সরকার আইন করে বলে দেন ২০০৫ সালের জুলাই মাস অবধি দুই ধরনের বানান চলতে পারে বটে, কিন্তু ২০০৫ সালের পয়লা আগস্টের পরে তা আর বলবৎ থাকবে না। কমিশন গঠিত হবার প্রায় বিশ বৎসর পরে তা কার্যে পরিণত হবে। এ কোনো স্বনিযুক্ত অভিভাবকের কাজ নয়। বিভিন্ন পন্ডিতজনের সমাবেশে গঠিত কমিশনের সম্মিলিত প্রয়াসে সংস্কার । জর্মনির একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্র (Frankfurter Alleghenies ট্রন্দ্বনব্ধক্তুন্ধ) প্রথমে তা গ্রহণ করলেও পরে তা বর্জন করে। ২০০৫ সালের অগাস্টের পরেও তা গ্রহণ করবে কিনা সন্দেহ। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ফ্রেদেরিখ দেনক নামক একজন অজ্ঞাত শিক্ষক এই সংস্কারের বিদ্ধে একটি ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করেন। ১৯৯৬ সালে ৬ অক্টোবার ফ্রাঙ্কফুর্ট পুস্তক মেলায় সংস্কারের বিদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১০০ জন লেখক, অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানী সেই ঘোষ্ণাপত্রে স্বাক্ষর করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম (আমাদের দেশে খুবই পরিচিত) গুন্টের গ্রাস। তাঁরা এই সংস্কার অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান। আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠানবিরোধী প্রতিবাদমুখর বুদ্ধিজীবী এককালে ছিলেন, এখন প্রতিষ্ঠান তাঁদের গ্রাস করে ফেলেছে। অথবা প্রতিষ্ঠানের কাছে তাঁরা আত্মহুতি দিয়েছেন, দিলে আখেরে যে অনেক লাভ এই সারমর্ম তাঁরা বুঝে গেছেন গত ২৭ বছরে। রাজ - লালিত এবং - পালিতরা ছাড়া কেউ কেউ প্রতিবাদ করছেন বটে, কিন্তু তাঁদের কথা এঁদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে না। শিশুপালবধের সংগঠিত আয়োজন পুরোদমে সঙঘটিত হতে চলেছে অনুমান তা বেশি দিন চলেতে পারবে না।

লাইনোটাইপ (এর ভিত্তিতে তৈরি হাতে কম্পোজের জন্য লাইনোফস) ফন্ট বেশি দিন চলে নি, মাদার ফন্টেই তাকে ঘিরে আসতে হয়েছে (হাতে কম্পোজের প্রেসে ‘মাদার ফন্ট’ বা ‘বিদ্যাসাগরি ফন্ট’ বলা হত শুনেছি)।সুরেশচন্দ্র মজুমদার, রাজশেখর বসু, শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন মহোদয়েরা সম্মিলিতভাবে ফন্ট জগতে যে বিরাট পরিবর্তন এনেছিলেন সেই ফন্ট দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। তা ছিল আত্মবিনাশী। বাংলা আকাদেমি উদ্ভাবিত ফন্টও তাই। সেই ফন্টের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার শবাধার।

।। কলকাতা ৱিবিদ্যালয়ের ভূমিকা ।।

পরিশেষে বলি কলকাতা ৱিবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি বানান সংস্কারের ব্যাপরে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন? তঁাদেরই তো উচিত এই ব্যাপারে সর্বস্তরের বিদগ্ধজনকে নিয়ে একটি সমিতি গঠন করে সর্ববাদীসম্মত বানানে নিয়মাবলি প্রস্তুত করা। যেমন হয়েছিল ১৯৩৬ -এ। কলকাতা ৱিবিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে অধিকারী পন্ড্তিের অভাব নেই। মুষ্টিমেয়ের প্রতিষ্ঠানের মতো হবে না, অরাজকতারও অবসান হবে, আর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যা তা হল তার মান্যতাও থাকবে। কারণ কলকাতা ৱিবিদ্যালয়ের যে স্বীকৃতি তা কোনো আকাদেমির হতে পারে না। আকাদেমি মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জমিদারি। সেখানকার প্রজারা জমিদারের হুকুম তালিম করেন।

সবশেষে হুতোমকে স্মরণ করা যেতে পারে। হুতোম বলেছিলেন বাঙলা ভাষাটা বেওয়ারিশ লুচির মতো, যে যা ইচ্ছে তাই করে। বাঙলা ভাষা তথা বর্ণমালাকে আকাদেমির কর্তারা বেওয়ারিশ লুচিই ভেবেছেন, তাই যা ইচ্ছে তাই করেছেন। হায়রে দুঃখিনী বর্ণমালা।



সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com